ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশ টাকার নোটটা হাতে নিয়েই বসে রইলেন রশিদ খান। ছেলে-মেয়ে দুটি এ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছে। ছেলেটি শুধু মাথা নেড়েছে হাত জোড় করে, মেয়েটি জিভ কেটে বলেছে, আমাদের প্রতি দিন মুদ্রা ছুঁতে নাই গো বাবু।

মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছে সিলিপ সিলিপ শব্দ করে। একটু আগে আর্দালি ওদের যথাযথ ভাবে কাপ-প্লেটে চা দিতে এসেছিল। তখন মেয়েটি বলেছিল, মাপ করবেন গো, আমরা বাসন কোসনে কিছু খাই না।

রশিদ খান ভাবলেন, টাকা নিতে চাইছে না কেন ওরা? পঞ্চাশ টাকা কি কম হয়েছে! একশো দিলে নেবে? মেয়েটি বলেছে, প্রতি দিন মুদ্রা ছুঁতে নাই। এর মধ্যে প্রতি দিন কথাটার মানে কী?

মেলার একটেরেয় পুলিশ সাহেবের রঙিন তাঁবু। এর নাম সুইস কটেজ। খানিক আগে এক বার টহল দিতে বেরিয়ে রশিদ খান এই দু'জনকে দেখতে পান। দু'জনেরই বয়েস বেশি না। ছেলেটি বছর তেইশ-চব্বিশেক, মেয়েটি একুশ-বাইশ। দু'জনেরই মুখে এখনও লেগে আছে কৈশোরের লাবণ্য। এলা মাটিতে ছোপানো এক জনের ধুতি আর পিরান, অন্য জনের শাড়ি, দু'জনেরই মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা।

সরকারি ভাবে মেলা শেষ হয়ে গেছে গত কাল। এখন ভাঙামেলা, ফের ার পালা। তবু মানুষজন আছে যথেষ্ট। ভিড়ের মধ্যে গান শোনা যায় না। নানা দিকে নানা অ্যামপ্লিফায়ারের ক্যাকোফোনি। তাই রশিদ খান ওদের ডেকে এনেছেন নিজের তাঁবুতে।

হাঁটতে হাঁটতেই তিনি জেনে নিয়েছিলেন, এরা কোনও প্রসিদ্ধ বাউলের চেলা নয়। এদের কোনও আখড়া নেই। দু'জনে মিলে জুটি বেঁধেছে। এক জঙ্গলের মধ্যে নাকি ওদের দেখা হয়েছিল। কথা বলে বেশ টুসটুসে রস ি মশিয়ে।

তোমাদের বাড়ি ছিল কোথায়? কোন গ্রামে? এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, গ্রামে তো নয়, মরুভূমিতে। আর ছেলেটি বলেছিল, সাগরে, আমি ভাসতে ভাসতে এসেছি।
আর গান শিখেছ কোথায়?
মেয়েটি বলেছিল, বাতাসের কাছ থেকে। কত শত গানই তো বাতাসে উড়ে উড়ে এসে আমাদের কানে সেঁধিয়ে যায়। বাতাস না থাকলে তো কিছুই শোনা যায় না।
ছেলেটি বলেছিল, মানুষ যখন কাঁদে, তখন তার মধ্যেও গান থাকে। তাই নয় কি বাবু?
রশিদ খান মাথা নেড়ে বলেছিলেন, ঠিক।
গ্রামের অনেক মানুষই রূপক মিশিয়ে ভাবের কথা বলে। এ সব শুনতে তাঁর মন্দ লাগে না।

কিন্তু এরা টাকা নেবে না কেন? বাউল তিনি ঢের দেখেছেন। বাউলরা তো আর যাযাবর নয়। তাদের মাথার ওপরে একটা ছাউনি থাকে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একটা সংসার থাকে। টাকা-পয়সা বর্জিত জীবন যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারুর কারুর মধ্যে কিছুটা ভোগবাদও ঢুকে গেছে। তা অস্বাভাবিকও নয়। এই তো কিছু দিন আগে এক বাউল তার ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠাবে বলে পাসপোর্টের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। যেখানেই বাউলরা গান শোনাতে যায়, সেখানে কি তারা কিছু টাকা-পয়সা আশা করে না? খুব বিনীত ভঙ্গিতে দরাদরিও করে। ট্রেনে যারা গান গায়—

রশিদ খান কখনও কারুকে ভিক্ষে দেন না। কেউ গলায় গাছা বেঁধে করুণ গলায় অভিনয় করে বাবার শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চাইতে এলে তিনি বলেন, যে-ছেলে অন্যের সাহায্য নিয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করে, তার বাবার আত্মার মুক্তি হয় না, ভূত হয়ে ফিরে আসে, তা জানো না?

কিন্তু ট্রেনে কেউ গান গেয়ে ভিক্ষে করলে রশিদ খান সব সময় কুড়ি-তিরিশ টাকা দেন তাকে। এটা ভিক্ষে নয়, এক জন সংগীতশিল্পীর দক্ষিণা। চা খাওয়া হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে দুটি এ বার বিদায় নেবে। র শিদ খান ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেললেন।

অনেকেই বলে, তাদের মধ্যে তাঁর কয়েক জন বন্ধুও, যে পুলিশ শুধু মানুষের কাছ থেকে নিতেই পারে, কোনও মানুষকে কিছু দেয় না। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি একটু হাসলেন। তার পর পকেট থেকে পার্সটা বার করে পঞ্চাশ টাকার নোটটা ঢুকিয়ে বার করলেন একটা পাঁচশো টাকার নোট।

সেটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এটা নাও, তোমাদের কাজে লাগবে!
এ বারেও ছেলেটি হাত জোড় করে মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল।
মেয়েটি বলল, মাপ করেন গো বাবু, আজ আমাদের মুদ্রা ছুঁতে নাই।
ঈষৎ বিরক্ত হয়ে রশিদ খান বললেন, আজ ছুঁতে নাই মানে? আজ তো মাদের কোনও ব্রত আছে?
মেয়েটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, না গো, ব্রত-ট্রত কিছু নাই। আজ আ মাদের মন ভাল আছে।
বেশ, মন ভাল আছে। কিন্তু কিছু খেতে-টেতে তো হবে! খিদে-তেষ্টা তো থেমে থাকবে না!
মন ভাল থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেমন গায়ে লাগে না। কিছু খেলেও হয়, না খেলেও চলে।
তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু কাল যদি মন ভাল না থাকে, তখন যে হু হু করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বেড়ে যাবে।
আপনি আশীর্বাদ করেন গো বাবু, যেন কালও আমাদের এমনটিই মন ভাল থাকে।
এর পর আর কথা চলে না। রশিদ খান গুম হয়ে রইলেন।

নমস্কার জানিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটি তাঁবু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রশিদ খান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হাঁক দিলেন, নিতাই, নিতাই! আর্দালি, নিতাইকে ডাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিতাই এসে উপস্থিত। নীল রঙের হাফ হাতা জামা ও ধুতি পরা। তার সরু গোঁফের মতন চোখের দৃষ্টিও ছুঁচোলো। সে এক জন আধা-পুলিশ। ইনফরমার। পার্ট-টাইম কাজ করে।

রশিদ খান বললেন, নিতাই, তোমাকে আমি একটা ডিউটি দিচ্ছি। এই যে ছেলেটা আর মেয়েটা বেরিয়ে গেল। তুমি ওদের খুব ডিসক্রিটলি ফলো করবে। দেখবে ওরা কোথায় যায়, কী খায়, কাদের সঙ্গে মেশে, রাত্তিরে কোথায় থাকে। এখন কটা বাজে? পৌনে আটটা। রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার এই ডিউটি, আমি সব ডিটেল্স চাই।

নিতাই কুতকুতে ধরনের হাসি দিয়ে বলল, আপনি স্যার ঠিকই আন্দাজ করেছেন। এদান্তি কিছু ছিনতাইবাজ আর ছিঁচকে চোর মাঝেসাঝে বাউলের ভেক ধরে থাকে। এমন অ্যাকটিং করে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। আপনার স্যার অভিজ্ঞ চোখ।

রশিদ খান বললেন, বটে! সে রকম কারুকে কারুকে তুমি চেন নিশ্চয়ই!
নিতাই বলল, তা তো আলবত চিনি। কয়েক ব্যাটাকে ধরিয়েও দিয়েছি। আপনার নিশ্চয় মনে আছে স্যার, গত মাসে এক ডাকাতির আসাম আবার ধরা পড়ল, এক বার পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পালিয়েছিল। সে ব্যাটাও তো আলখাল্লা পরে ঘাপটি মেরে ছিল এক বাউলদের ঠেকে। আমিই দূর থেকে আঙুল দেখিয়ে....
রশিদ খান জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলে-মেয়ে দুটোও সেই দলের?

নিতাই বলল, তা এখনই ঠিক বলতে পারব না স্যার। এরা লাইনে নতুন এসেছে। আগে দেখিনি। তবে জানি, ছিনতাইবাজদের যে রিংটা আছে, তারা এখন বেছে বেছে অল্প বয়েসিদের রিক্রুট করছে।
রশিদ খান বললেন, যাও আর দেরি কোরো না। যদি ওরা হারিয়ে যায়....

নিতাই চলে যাবার পর রশিদ খান অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে জরুরি কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ ভাঙা মেলাতেও তিনটি ছিনতাইয়ের কেস ধরা পড়েছে। দুটো ধরা পড়েনি। একটা বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছে, একটা দোকানের ক্যাশ থেকে চুরি গেছে সাঁইতিরিশ হাজার টাকা....

এই সময় ওই ছেলে-মেয়ে দুটির কথা তিনি ভুলে গেলেন, অথচ মনেও রাখলেন। অর্থাৎ মনের ওপরের স্তরে শুধু কাজের কথাবার্তা, আর ভেতরের স্তরে গাঁথা রইল ওদের মুখচ্ছবি।

সাড়ে ন'টার পর তিনি একলা থাকতে চান। এ সময় তাঁর কয়েক পাত্র হুইস্কি পান না করলে চলে না। ক্যাসেটে উচ্চাঙ্গ সংগীত বাজে। পুলিশের পরিচয়ের বাইরে তিনি এক জন সংগীতপ্রিয় মানুষ এবং শখের কবি।

রশিদ খান তাঁর হেড কোয়ার্টারে বেশি থাকেন না, প্রায়ই ট্যুরে যান এদিক-সেদিক। পরিবারে তাঁর যে সে রকম কিছু অশান্তি আছে তা নয়। ঘুরে বেড়ানো তাঁর নেশা। বিভিন্ন ডাক বাংলোয় কিংবা তাঁবুতে থাকা তাঁর বেশ পছন্দ। অনেক সময় তাঁর কয়েকজন বন্ধুও সঙ্গে থাকে। এ বারেও দু'জন কবি বন্ধু ছিল। তারা ফিরে গেছে সন্ধের একটু আগে।

রাত্রি জাগরণেও তাঁর ক্লান্তি নেই। যথেষ্ট হুইস্কি পান করলেও তিনি সহজে বেএক্তার হন না বরং তাঁর কান তখন অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়, গান বেশি করে মর্মে যায়।
রাত বারোটা পঞ্চাশে নিতাই তাঁবুর বাইরে থেকে সন্তর্পণে মৃদু গলায় ডাকল, স্যার, স্যার!

ভেতরে এসে নিতাই যে রিপোর্ট দিল তা বেশ সংক্ষিপ্ত এবং মামুলি। সত্যতার প্রমাণ দেবার জন্য সে একটা ছোট খাতায় লিখে এনেছে। আটটা পঁচিশ, রথতলার টিউকলে জলপান, আবার হাঁটা, এক জায়গায় দুটো লরি অ্যাকসিডেন্ট করেছে, ওরা দাঁড়ায়নি। নটা দশ একটা গাছতলায় বসল। পৌনে এগারোটায় আবার হাঁটা। সাইড রোড দিয়ে ব্যাক করেছে। বাঁকিপুরের যে পুরোনো শিবমন্দিরের চাতাল, বসল গিয়ে

সেখানে। আরও কয়েকজন শুয়ে ছিল। ওরা খানিকটা দূরে। তার পর বারোটা পাঁচ পর্যন্ত নিতাই ওদের ওয়াচ করেছে।

না, গাঁজা খায়নি। অন্য কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলেনি। কোনও খাবারও খায়নি, যত দূর মনে হয়, হয়তো একটা পুটুলিতে চিঁড়ে-মুড়ি থাকতেও পারে।
রশিদ খান জিজ্ঞেস করলেন, শিবমন্দিরের চাতালে গিয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল?
নিতাই বলল, না স্যার, আমি যতক্ষণ ছিলুম, ওরা শোয়নি, মুখোমুখি বসেই ছিল, আর গাইছিল গুন গুন করে।
কী গান গাইছিল, শুনেছিলে?

না স্যার, অত কাছে যাইনি, তবে এক বার একটা পাখি ডেকে উঠল। ওই যে-পাখি রাত্তিরেও ডাকে— চোখ গেল, চোখ গেল বলে, হিন্দিতে বলে পিউ কাঁহা, সেই পাখিটা ডেকে উঠতেই এ মেয়েটা গলা মেলালো। পাখিটাও উত্তর দিল!

একটু থেমে নিতাই আবার বলল, একটা কথা বলব স্যার? আমার মনে হল, মেয়েটাই ছেলেটাকে পটকেছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, ছেলেটা নরম-সরম, মেয়েটা ওস্তাদনি, ও-ই ছেলেটাকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে টেনে এনেছে। এখন হিঁদু আর মোছলমান হলেই গন্ডগোল হতে পারে। এই সব প্রেম তো পাবলিক পছন্দ করে না। এক বার বক্রেশ্বরের এক গোয়ালাদের মেয়েকে নিয়ে একটা মোছলমান ছেলে পালিয়েছিল—
রশিদ খান হাত তুলে নিতাইকে থামতে বললেন।
নিতাই তবু বলল, স্যার, কাল আবার ওদের ফলো করব? যদি জাত-ফাতের গণ্ডগোল থাকে....
রশিদ খান বললেন, এ সব নিয়ে তুমি বিনোদ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলো। আমাকে আর কিছু রিপোর্ট করার দরকার নেই!

রশিদ খান ওই ছেলে-মেয়ে দুটি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। জাত-ফাতের ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন। পাঁচশো টাকার নোট নিতে অস্বীকার করার জন্যই তিনি ওদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। হয়তো ভাল বংশের ছেলে মেয়ে, হয়তো জমানো টাকা আছে। ওরা যে গান গেয়েছিল, তা আহামরি কিছু নয়, মাঝারি গোছের বলা যেতে পারে। রশিদ খান তেমন কিছু বাউল গানের ভক্তও নন, দু'তিনখানার বেশি শুনতে চান না, এক ঘেয়ে লাগে। তাঁর মন মজে আছে মার্গ সংগীতে। সুতরাং ওই বাউল যুগলকে মনে রাখার কোনও কারণ র ইল না।
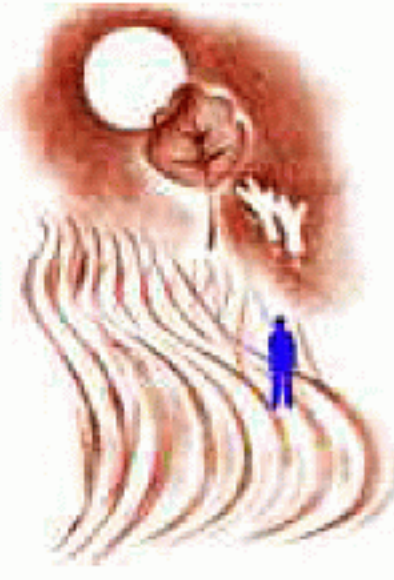
দু'দিন পর তিনি ছেলে ও মেয়েটিকে আবার দেখতে পেলেন আমেদপুরের রাস্তায়। সারা সকাল আকাশ মেঘে কালো হয়ে ছিল। শোনা যাচ্ছিল গুরুগুরু শব্দ, সূর্যকে দেখা যায়নি। দুপুরের পর শুরু হয়েছে বর্ষণ, আকাশ যেন পুকুর ঢেলে দিচ্ছে। গাড়ি নিয়ে বোলপুরের দিকে যেতে যেতে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, থামো থামো! বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটি ও মেয়েটি। বৃষ্টির জন্য কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই, জ্যোৎস্নার মধ্যে বসন্ত বাতাসেও মানুষ এ ভাবে হাঁটতে পারে।
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রশিদ খান বললেন, এই ভিজছ কেন? উঠে এসো, উঠে এসো।
দু'জনেই হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে। হাত তুলে নমস্কার করল।
রশিদ খান আবার বললেন, ওঠো, গাড়িতে উঠে এসো।
ছেলেটি বলল, কেন সাহেব, আমাদের হাঁটতেই ভাল লাগছে।
রশিদ বলল, তা বলে এ ভাবে ভিজবে? অসুখ করবে যে!
মেয়েটি বলল, এই যে গাছগুলো ভিজছে? ওই যে মাঠে কয়েকটা গরু, ওরা ভিজছে। ওদের তো কোনও অসুখ করে না!
গাড়িতে অন্য পুলিশরা হেসে উঠল। রশিদ খান বললেন, ওদের সঙ্গে বুঝি মানুষের তফাত নেই? মানুষ তো জামা কাপড় গায় দেয়।
মেয়েটি বলল, আমরা বৃষ্টিকে ডাকছিলাম, কখন বৃষ্টি আসবে, কখন বৃষ্টি আসবে! এখন বৃষ্টি এসেছে, আমরা যদি পালিয়ে যাই বৃষ্টি রাগ করবে না?
রশিদ খান তাঁর এক সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, পাগল আর কাকে বলে! অবশ্য বয়েস কম, ভিজুক। ভিজুক যত ইচ্ছে।
গাড়িটা ওদের ফেলে বেরিয়ে গেল।

দিল্লি থেকে এক জন বেশ বড় গোছের ভি আই পি আসছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিখুঁত করার জন্য রশিদ খানকে এখন প্রায়ই আসতে হচ্ছে এ দিকে।

যাওয়া-আসার পথে আমেদপুরের রাস্তাতেই আবার দেখতে পেলেন ছেলেটিকে এক বিকেল-সায়াহ্নের আলো-আঁধারিতে। গুপী যন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে। এক গাছতলার নির্জনে।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন, খানিকটা এগিয়ে গিয়েও গাড়িটা আবার পিছিয়ে এল। ওরা কী খায়। কেমন করে খাওয়া জোটায়, এটাই তিনি জানতে চান।

ওদের দেখেও ছেলেটি গান বন্ধ করল না। রশিদ খান ধারে-কাছে কোথাও মেয়েটিকে দেখতে পেলেন না। অথচ তার মনে হয়েছিল, ওরা অবিচ্ছেদ্য।
তিনি এখন ব্যস্ত, তাই গান শেষ হবার অপেক্ষা না করেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওহে তোমার সঙ্গিনীটি কোথায় গেল? সেই যে মরুভূমির মেয়ে?
ছেলেটি গান থামিয়ে ভক্তি ভরে নমস্কার জানিয়ে মৃদু গলায় বলল, সে তো এখানে নেই। তাকে মরুভূমির মানুষরাই নিয়ে গেছে।
রশিদ খান বুঝতে না পেরে বললেন, মরুভূমির মানুষরা মানে? ওদের বাড়ির লোকজনরা?
ছেলেটি বলল, না গো বাবু। মরুভূমির মানুষরা, যাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া কিছু নেই।
এ বারে অস্থির হয়ে খানিকটা ধমক দিয়ে বললেন, রহস্য ছাড়ো। সোজা কথায় বলো, কারা নিয়ে গেছে? জোর করে?
ছেলেটি বলল, চার-পাঁচজন জোয়ান-মদ্দ, মনে হয় যেন তারা পাতালের প্রাণী, হাতে লাঠি-সোঁটা, সবলে নিয়ে গেল।
রশিদ খান বললেন, মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে গেল, তুমি কিছু করতে পারলে না?
ছেলেটি নিরুত্তাপ গলায় বলল, অতজনকে রুখব, সে শক্তি তো ভগবান আমাকে দেননি। আপনি থাকলে পারতেন।
রশিদ খান বুঝলেন, এ প্রশ্নটা করা তাঁর উচিত হয়নি। এ ছেলেটাকেও যে খুন করে রেখে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের!
কখন এটা ঘটেছে?
আজকের দিনটা গেল। কালকের রাত, তার পরের দিন যখন শুরু, সবে মাত্র পাখি ডেকেছে
তুমি এর মধ্যে আমাকে খবর দাওনি কেন?
আজ্ঞে, আমি এ জায়গা ছেড়ে যাই কী করে? সে যখন ফিরে আসবে, তখন যে আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রশিদ খানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ফিরে আসবে? ওরা আর ফিরে আসে না। নারী-হরণের ঘটনা সম্প্রতি বেড়েছে। মেয়েটির তেমন কিছু রূপের জেল্লা না থাকুক, শরীরটা তো বাঁকা চোরা নয়, সুস্বাস্থ্যের একটা দীপ্তি আছে। ওই সব লোকদের চোখে সে শুধু লোভনীয় নারী-মাংস। আজকাল গাছতলার নীচে পথিকরাও ঘুমোয় না।

ধরে নিয়ে গিয়ে শুধু ধর্ষণ নয়, তার পর খুন করে ফেলাটাই এখনকার রেওয়াজ। ছ’-সাত বছরের মেয়েকেও ধর্ষণ করে। তাতেও আনন্দ পায়? না, আনন্দ-টানন্দ কিছু নয়, সে বোধ যাদের থাকে, তারা রক্ত দর্শন করে না। ধর্ষণের পর বিক্রিও করে দেয়, অনবরত জ্যান্ত মেয়ে-শরীর চালান যাচ্ছে দেশ-বিদেশে।

প্রথমে ছেলেটার ওপরেই খানিকটা রাগ হল তাঁর। এ ছেলেটা এত অপদার্থ কেন? শুধু কাব্য করলে চলে? সঙ্গিনীর নিরাপত্তার কথা না ভেবে মন্দিরের চাতালে কিংবা গাছতলায় শুয়ে থাকছে? এ তো ওদের লোভ দেখানো!
তিনি কর্কশ গলায় বললেন, থানাতেও খবর দাওনি, শুধু এখানেই বসে থাকলে চলবে?
ছেলেটি বলল, আমার তো অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। সে এখানেই ফিরে আসবে যে! এখানেই আবার দেখা হবে!
যারা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের হাত ছাড়িয়ে সে ফিরবে কী করে?
ফিরতে তো তাকে হবেই। যদি বাঁধন ছিড়তে না পারে, তা হলে বাঁধনের মধ্যেই সে ডুব দেবে।
ধরো যদি সত্যিই সে ফিরে না আসে?
বললাম তো বাবু, কোনও বাঁধনই তাকে ধরে রাখতে পারবে না। শরীরটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সে আর থাকবে না সেখানে। আর তাই-ই যদি হয়, তা হলে সে খবরও আমি ঠিক পেয়ে যাব। এখানে বসে বসেই পাব। বাতাস শুনিয়ে যাবে। তখন আমি আর এখানে বসে থেকে কী করব। এই খাঁচা থেকেও পাখিটাকে উড়িয়ে দেব।

রশিদ খান মনে মনে বললেন, এ যে দেখছি এ যুগের রোমিও-জুলিয়েট। আদিখ্যেতা আর কাকে বলে! তার পরেই তিনি তাঁর সহকর্মীদের দিকে ফিরে তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, বিনোদবাবু, আপনারা কী করতে আছেন? প্রায় প্রত্যেক দিনই যে একটা-দুটো মেয়েকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে....
বিনোদবাবু বললেন, স্যার, এফ আই আর করা হয়নি।
আরও গলা তুলে রশিদ খান বললেন, জেনারেল সিচুয়েশন যে এত খার

াপ হচ্ছে, সেটা আপনারা দেখবেন না। এফ আই আর-এর নিকুচি করে ছে। ক্রাইম হবার আগে প্রিভেনশনও বুঝি পুলিশের কাজ নয়? সে সব বুঝি ভুলে গেছেন! শুনুন, আমি আপনাদের ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আগে দেখুন, কাছাকাছি তার বডি পাওয়া যায় কি না। যদি না পাওয়া যায়, ওয়েল অ্যান্ড গুড, তাকে কোথাও আটকে রেখেছে পাচার করার জন্য। সেই সব গ্যাঙের যে-কোনও একটাকে ধরুন। আপনারা চেনেন, আমি জানি। ওরা একদমেই মেয়েগুলোকে অনেক দূর নিয়ে যায় না। থেমে থেমে যায়। ওদের অনেক হাইড আউট থাকে। রেল পুলিশকে অ্যালার্ট করুন। বর্ধ মান আর মুর্শিদাবাদের এস পি-দের মেসেজ পাঠান। আমি বেশি রাত্তিরে ওঁদের সঙ্গে কথা বলব।

পুলিশ অনেক কিছু পারে না। আবার অনেক কিছু পেরেও যায়। যা পারে না, তা বোধহয় পারতে চায়ও না। আর যা পারতে চায়, তা পেরে যেতে দেরি হয় না।

আটচল্লিশ ঘন্টার একটু আগেই সেই বাউল সঙ্গিনীটিকে উদ্ধার করা হল হেতমপুরের এক পোড়ো বাড়ি থেকে। মৃত নয়, জ্যান্ত। সঙ্গে আরও সাতটি মেয়ে।
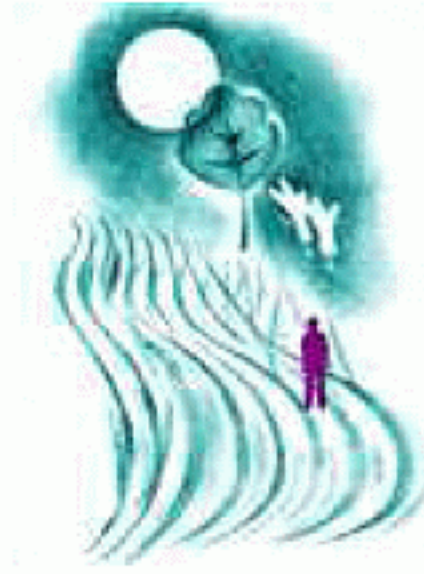
টেলিফোনে খবর দেওয়া হল রশিদ খানকে। অন্য মেয়েদের থানায় রেখে এই মেয়েটিকে নিয়ে আসা হল তাঁর কাছে। তিনি তখন বোলপুরের পি ডব্লিউ ডি বাংলোতে অবস্থান করছেন।

মেয়েটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তিনি। এই কয়েকটি দিনেই তাকে অনেক শীর্ণ মনে হচ্ছে। চোখের নীচে যেন কেউ লেপে দিয়েছে ভুসো কালি। পোশাক ধুলিমলিন, কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়া। কিন্তু শরীরে দৃশ্যমান আঁচড়-কামড়ের দাগ নেই। চুল খোলা বলে তার মুখটাও একটু অন্য রকম।

রশিদ খান একটু পরে কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না?

সে দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, না, তেমন কিছু নয়। রশিদ খান আবার বললেন, তোমার ওপর ওরা, ইয়ে, মানে, অত্যাচার করেছে? মেয়েটি বলল, শরীরটাকে যদি কখনও মনে করা যায়, এটা আমার নয়.... মানে এ শরীর আর নিজের নয়, এই বোধ পাকা হলে তখন কে কী অত্যাচার করল না করল, তাও তো বোঝা যায় না। তখন শরীর হয়ে যায় দেহ। তার কোনও সাড়া শব্দ নেই।
বেশ চিন্তিত হয়ে রশিদ খান বললেন, এ তো উচ্চাঙ্গ জ্ঞানের কথা। তুমি এত কম বয়েসে এ সব শিখলে কী করে?
মেয়েটি বলল, আমি তো কিছু শিখিনি। আমি শুধু আমার মনটাকে বুঝবার চেষ্টা করি। মনই তো সব কথার উত্তর দেয়।
তোমাকে যখন ওরা জোর করে তুলে নিয়ে গেল, তখন তুমি ভয় পাওনি?
মরুভূমিতে তো কত রকম বিপদ-আপদই ঘটে। কত মানুষ অসময়ে হারিয়ে যায়। আবার এই সবের মধ্যেই তো কত সাধ-আহ্লাদ!

শেষ কথাটুকু না শুনেই রশিদ খান চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ে গেছে সেই ছেলেটির কথা। সে বলেছিল, গাছতলাতেই বসে থাকবে। আরও বলেছিল, বাতাস তাকে দুঃসংবাদ দিলে সেও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে! বাতাসে তো কত রকম ভুল খবর, দুঃসংবাদ ছড়ায়। এর মধ্যে ছোকরাটি আবার আত্মহত্যা-টত্যা করে বসেনি তো? তখন এই মেয়েটি, আবার রোমিও জুলিয়েট?

এই দু'দিন ভি আই পি-ব্যস্ততার জন্য তিনি ছেলেটির কোনও খবর নিতে পারেননি।
তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, গাড়িতে স্টার্ট দাও, এক্ষুনি যেতে হবে।

গাড়িতে বসে মেয়েটির সঙ্গে আর কোনও কথা হল না। তাঁর মনে পড়ল রজনীকান্তের একটা গান, 'যবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব....'। সংসারটাকে মরুভূমির সঙ্গে তুলনা দেবার একটা ধারণা এদের মধ্যেও চালু আছে। আর ছেলেটি যে বলেছিল সাগরের কথা, ভব সমুদ্র তো বলেই! বই না পড়েও এরা এগুলো শিখে যায়।

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, এ বার দেখা হবার পর ওরা দু'জন প্রথমে কী বলবে? তিনি কল্পনায় দেখলেন, সেই গাছতলায় পৌঁছবার পর গাড়ি থেকে নেমেই মরুকন্যাটি ছুটতে ছুটতে গেল সেই সাগর-সন্তানের দিকে। কোনও কথা নয়, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুধু কান্না। কান্নার মধ্যে মিলন দৃশ্য যেমন মধুর, তেমনই দুর্লভ। ছেলেটি বলেছিল, মানুষের কান্নার মধ্যেও গান থাকে। ঠিকই বলেছিল।

আসলে কিন্তু তেমন ঘটল না। সেই গাছতলায় এসে গাড়িটা থামল র
াস্তার উল্টো দিকে। ছেলেটি বসে আছে গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে,
যেন সে এই ক'দিন ওখান থেকে এক বারও ওঠেনি। যেন সে গৌত
ম বুদ্ধের মতন বসে আছে সাধনায়। আকাশ আজ পরিষ্কার, জ্যোৎস্নায়
তাকে দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

মেয়েটি আস্তে আস্তে নামল গাড়ি থেকে। দৌড়ে গেল না। সে বলে
উঠল, সেই ফুল কোথায় গেল গো, যে ফুলে ভ্রমর বসেনি....
ছেলেটি উঠে দাঁড়াল না, কোনও উত্তেজনা নেই। সে বলে উঠল, নদীতে
নাই জলের ধারা, নদী আছে সেইখানে
সুর দিয়ে বলছে ছেলেটি, মেয়েটির বাণীতেও একটু সুর ছিল।
মেয়েটি আবার সুর করে বলল, একাদশীর চাঁদ উঠেছে, বাজিছে মোহন
বাঁশি
ছেলেটি গাইল, পিঁপড়ায় মধু খেয়েছে, পিঁপড়া এখন দিক জানে না
মেয়েটি গাইল, অচিন দেশের নাইয়া এখন নাওয়ের মধ্যে ঘুমায়
ছেলেটি গাইল, চক্ষু ভরে দেখছ রে মন, চক্ষু কিন্তু মন দেখেনি

বিস্ময়ে রশিদ খানের চোখ দুটি ঠিকরে পড়ার মতন অবস্থা। এ রক
ম বিপর্যয়ের পরও দেখা হতে ওরা গান গাইছে? এ কি হিন্দি সিনেমা?
এটা ওদের দেখানেপনা!

তার পরেই তিনি বুঝলেন, এর মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা নেই। এ গান ঠিক
সংলাপও নয়, চরণের শেষে মিল নেই। যেন আলাদা আলাদা গানের
লাইন। পরস্পরের কুশল সংবাদের বদলে গানের বিনিময়। কিংবা, এ কি
কোনও গুপ্ত সংকেতের ভাষা? এর মধ্যে রয়েছে এক তীব্র আকুতি, যেন
দুটি পাখির সাড়া দেওয়া ডাক।

হঠাৎ এক তীব্র ভালবাসার আবেগে রশিদ খানের বুক ভরে গেল। তিনি
এক বার কেঁপে উঠলেন। তাঁর উপলব্ধি হল, আর কোনও মানুষের সঙ্গে
ওদের তুলনা হয় না। নিশ্চিত ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়। ওরা এই
পৃথিবীর কেউ নয়। একটু বেড়াতে এসেছে। ইচ্ছে করলেই ওরা এই
মরুভূমি ছেড়ে চলে যেতে পারে যে-কোনও সময়ে।

ওরা কি সেই কথাই বলতে চাইছে গানের মধ্যে। তা হলে তো এখনি ওর া অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে দৃশ্য দেখতে নেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রশিদ খান চক্ষু বুজে ফেললেন। কত ক্ষণ লাগবে অদৃশ্য হতে? বড় জোর দশ সেকেন্ড, তার মধ্যেই ওরা দু'জনে দু'জনকে ছুঁয়ে ফেলবে হাত বাড়িয়ে। তিনি মনে মনে গুনতে লাগলেন, এক দুই তিন চার....